



মালয়শেয়ীয় শ্রমবাজার: সম্ভাবনা ও অভিজ্ঞতা

লেখক: অধ্যাপক ড. কাজী আ. মান্নান | প্রকাশিত: 13 September 2026, 10:53 AM | বিভাগ: ফচার



মালয়শেয়ীয় শ্রমবাজার নিয়ে বাংলাদেশে আবার আলোচনা শুরু হয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্যে জানা যাচ্ছে, বাংলাদেশ থেকে মালয়শেয়ীয় কর্মী পাঠানোর ক্ষেত্রে সীমিতসংখ্যক রকিবুটিং এজেন্সিকে সুযোগ দেওয়ার বিষয়টি নিয়ে নতুন করে বতিরক সৃষ্টি হয়েছে। অভিজোগ উঠছে, মাত্র ২৫টি এজেন্সিকে কেন্দ্র করে আবারও একটি সীমিত নিয়োগব্যবস্থা বা তথাকথিত সিন্ডিকেটে গড়ে উঠতে পারে। একই সঙ্গে একজন কর্মীর মালয়শেয়া যতে ছয় থেকে সাত লাখ টাকা পর্যন্ত ব্যয় হওয়ার আশঙ্কার কথাও বলা হচ্ছে। এসব অভিজোগের সত্যতা ও বাস্তব পরিস্থিতি যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে যাচাই হওয়া প্রয়োজন। তবে একটি বিষয় অস্বীকার করার উপায় নেই মালয়শেয়ীয় শ্রমবাজারে বাংলাদেশের অতীত অভিজ্ঞতা আমাদের যথেষ্ট সতর্ক হওয়ার শিক্ষা দিয়ে।

মালয়শেয়ীয় শ্রমবাজার আমার কাছে শুধু সাম্প্রতিক সংবাদ বা রাজনৈতিক বতিরক্রে বিষয় নয়। প্রায় তিন দশক ধরে আন্তর্জাতিক শ্রম অভিবাসন, রেমিট্যান্স এবং বিশেষভাবে বাংলাদেশ থেকে মালয়শেয়ীয় শ্রম অভিবাসনের বিভিন্ন দিক নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে আমি এই বাজারের সম্ভাবনা যমেন দেখেছি, তমেনিএর কাঠামোগত দুর্বলতাও প্রত্যক্ষ করেছি। আমার গবেষণার একটিবিড় অংশই ছিল বাংলাদেশ থেকে মালয়শেয়ীয় অদক্ষ ও স্বল্পময়োদ শ্রম অভিবাসন, অভিবাসনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ, ব্যয় ও ঝুঁকি,

পরবারে এর অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রভাব এবং রেমিট্যান্সের গতিপ্রকৃতি নিয়ে। এই দীর্ঘ গবেষণা ও অভিজ্ঞতা থেকে আমার কাছে একটি বিষয় কর্মমহে স্পষ্ট হয়েছে মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশের শ্রমবাজারের মূল সংকট বাজারের অভাব নয়; সংকট হচ্ছে বাজার ব্যবস্থাপনায়।

বাংলাদেশে ও মালয়েশিয়ার শ্রমবাজারের মধ্যে একটি স্বাভাবিক অর্থনৈতিক পরিপূরকতা রয়েছে। বাংলাদেশে কর্মক্ষম মানুষের সংখ্যা বপিল। প্রতিনিহিত্ব বপিলসংখ্যক তরুণ শ্রমবাজারে প্রবশে করছেন, যাদের সবার জন্য দেশের অভ্যন্তরে প্রত্যাশিত কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা কঠিন। অন্যদিকে মালয়েশিয়ার অর্থনৈতিক বিকাশ, শলি্পায়ন ও নগরায়ণের ফলে এমন অনেকে খাতে শ্রমকিরে চাহদি তরৈইহয়ছে, যখনে স্থানীয় কর্মীদরে আগ্রহ তুলনামূলক কম। বিশিষে করে নরিমাণ, প্ল্যান্টেশন, কৃষি, ম্যানুফ্যাকচারিং, পরিচ্ছন্নতা এবং বিভিন্ন শ্রমঘন সবোখাতে বদিশে কির্মীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছেন। শ্রম অর্থনীতিতে এসব কাজেরে একটি অংশকে প্রায়ই থ্রি-ডি জিবস, যথা ডারটি, ডনেঞ্জারাস এবং ডফিকাল্ট হিসেবে চহিনতি করা হয়।

২০১৫ সালে প্রকাশিত আমার একটি গবেষণায় আমরা এই বাস্তবতাকে বাংলাদেশে ও মালয়েশিয়ার মধ্যে উন্নয়নশীল দেশে থেকে উন্নয়নশীল দেশে শ্রম অভিবাসন-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হিসেবে দেখেছিলাম। বাংলাদেশেরে রয়েছে শ্রম উদ্বৃত্ত এবং মালয়েশিয়ার রয়েছে নরিদৃষ্টি খাতে সাধারণ শ্রম ঘাটতি। অর্থনৈতিকভাবে এই দুই অবস্থার সমন্বয় উভয় দেশেরে জন্যই লাভজনক হতে পারে। মালয়েশিয়া পায় প্রয়োজনীয় শ্রমশক্তি, বাংলাদেশে পায় কর্মসংস্থান ও বৈদেশিক মুদ্রা এবং একজন অভিবাসী কর্মীর পরিবার পায় আয় ও জীবনমান উন্নয়নের সুযোগ। কিন্তু এই সহজ অর্থনৈতিক সমীকরণেরে মাঝখানে যখন অস্বাভাবিক অভিবাসন ব্যয়, মধ্যস্বত্বভোগী, অস্বচ্ছ নিয়োগপ্রক্রিয়া এবং সীমিতসংখ্যক প্রতিনিহিত্বেরে নয়িন্ত্রণ তরৈইহয়, তখন সম্ভাব্য লাভেরে একটি বড় অংশ কর্মীর কাছে পট্টেছায় না।

আমাদের শ্রমবাজার নিয়ে আলোচনায় প্রায়ই বলা হয়, বছরে কত লাখ কর্মী বদিশে গলেনে। কিন্তু সংখ্যাটি একা শ্রম অভিবাসনের সাফল্য প্রকাশ করে না। ধরা যাক, একজন কর্মী মালয়েশিয়া যতে ছয় লাখ টাকা ব্যয় করলেনে। এই অর্থেরে বড় অংশ যদি তিনি জমি বিক্রিরে, আত্মীয়েরে কাছ থেকে ধার নিয়ে কংবা উচ্চ সুদে ঋণ করে সংগ্রহ করেনে তাহলে মালয়েশিয়ায় পট্টেছানোর মুহূর্তেই তিনি কয়কে লাখ টাকার দায় নিয়ে তাঁর কর্মজীবন শুরু করছেন। প্রথম কয়কে মাস বা বছর তাঁর প্রধান লক্ষ্য হবে ঋণ পরিশোধ করা। ফলে বদিশে তাঁর প্রকৃত সঞ্চেয় কত হচ্ছে, পরিবারেরে জীবনমান কতটা উন্নত হচ্ছে কংবা তিনি দেশে ফরিরে উৎপাদনশীল বনিয়োগ করতে পারবেনে কিনা-এসব প্রশ্ন অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই জায়গায় অভিবাসন খরচকে একটি সাধারণ প্রশাসনিক বিষয় হিসেবে দেখার সুযোগ নাই। এটি শ্রম অভিবাসনের বনিয়োগেরে ওপর রটরিন নরিধারণ করে।

একজন কর্মী যদি তিনি লাখ টাকা খরচ করে একই চাকরিতে যতে পারেনে, তাহলে ছয় লাখ টাকা খরচ করা

কর্মীর তুলনায় তাঁর অভাবাসনের অর্থনৈতিক লাভ অনেকে বেশি হবে। অথচ দুজনই সরকারি পরিসংখ্যানে একজন করে বাদশেগামী কর্মী। এ কারণে শুধু কতজন কর্মী বাদশে পাঠানো হলো তা দিয়ে সাফল্য বচার না করে দেখতে হবে প্রতি কর্মীর অভাবাসন ব্যয় কত, প্রকৃত আয় কত, ঋণ পরিশোধে কত সময় লাগছে এবং শেষে পর্যন্ত পরিবারে কত টাকা পট্টোচ্ছ। মালয়শিয়ায় বাংলাদেশি কর্মী ও রেমিট্যান্স নিয়ে আমাদের গবেষণায় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সামনে এসেছিল। অভাবাসী জনসংখ্যা বাড়লে একই অনুপাতে মাথাপিছু প্রবাসী আয় বাড়বে-বাস্তবে এমন সরল সম্পর্ক সবসময় পাওয়া যায় না।

২০০৫ থেকে ২০১৪ সালের তথ্য বিশ্লেষণ করে আমরা দেখেছিলাম, বিভিন্ন হিসাবের ভিত্তিতে অভাবাসী জনসংখ্যার পরিবর্তনের তুলনায় মাথাপিছু প্রবাসী আয়ের পরিবর্তন অনেকে বেশি ছিল। এই অস্বাভাবিক পার্থক্যই আমাদের নথিভুক্ত ও অনথিভুক্ত অভাবাসী জনসংখ্যা এবং আনুষ্টানিক ও অনানুষ্টানিক রেমিট্যান্স দুটিকে আরও গভীরভাবে অনুসন্ধানের প্রয়োজনীয়তার দিকে নিয়ে গিয়েছিল। এক দশক পরও প্রশ্নটি প্রাসঙ্গিক। বাংলাদেশে লক্ষ্য কী শুধু বেশি কর্মী পাঠানো, নাকি প্রত্যেকে কর্মীর উৎপাদনশীলতা ও আয় বাড়ানো? আমার মতে, দ্বিতীয়টিই ভবিষ্যৎ নীতির ভিত্তি হওয়া উচিত।

বর্তমানে সীমিতসংখ্যক রিক্রুটিং এজেন্সরি মাধ্যমে মালয়শিয়ায় কর্মী পাঠানো নিয়ে যে বতিরক তৈরি হয়েছে, সেটিকে কেবল রাজনৈতিক বক্তব্য হিসেবে দেখলে সমস্যাটির অর্থনৈতিক গুরুত্ব উপেক্ষিত হবে। কোনো নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগের সত্যতা অবশ্যই যথাযথ তদন্তের বিষয়। কিন্তু অর্থনীতির দৃষ্টিতে প্রশ্নটি অনেকে সহজ, বাজারে প্রতিযোগিতা সীমিত হলে অভাবাসন ব্যয় বাড়ার ঝুঁকি সৃষ্টি হয় কিনা?

সাধারণভাবে কোনো সর্বোবাজারে সরবরাহকারীর সংখ্যা কৃত্রিমভাবে সীমিত হলে প্রতিযোগিতা কমতে পারে। তবে আন্তর্জাতিক শ্রম নিয়োগ সাধারণ বাজার নয়; এখানে অভাবাসী গ্রহণকারী দেশের নিরাপত্তা, আইন ও বধিবিধান পরিপালন, নিয়োগকর্তা যাচাইকরণ এবং অভাবাসন ব্যবস্থাপনার মতো বিষয় রয়েছে। তাই সব লাইসেন্সধারী এজেন্সিকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে অনুমতি দেওয়াও একমাত্র সমাধান নয়।

কেন ২৫টি প্রতিষ্ঠান? যদি ২৫টিই প্রয়োজন হয়, তাহলে তারা কোন প্রকাশ্য মানদণ্ডে নির্বাচিত হয়েছে? তাদের অতীত কর্মদক্ষতা কী? কর্মীর অভিযোগ নথিপত্রের রেকর্ড কমন? অভাবাসন ব্যয় ন্যূনতরণে তাদের সক্ষমতা কী? আবার যদি আরও ১০০টি প্রতিষ্ঠান একই মানদণ্ডে পূরণ করতে পারে, তাহলে তাদের বাদ দেওয়ার যৌক্তিকতা কী? এই প্রশ্নগুলোর স্বচ্ছ উত্তরই সিন্ডিকেটে বতিরক্রে সবচেয়ে কার্যকর সমাধান হতে পারে।

বাংলাদেশে বৈধ রিক্রুটিং এজেন্সরি সংখ্যা অনেকে। কিন্তু শুধু লাইসেন্স থাকাই আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারে কর্মী পাঠানোর একমাত্র যোগ্যতা হতে পারে না। আমরা বরং একটি কর্মদক্ষতা ও ফলাফলভিত্তিক উন্মুক্ত স্বীকৃতি ব্যবস্থার কথা বলব। যে রিক্রুটিং এজেন্সি নির্ধারণিত আর্থিক

সক্ষমতা, অভিজ্ঞতা, নৈতিক নিয়োগনীতি, কর্মীর অভিযোগ ব্যবস্থাপনা এবং মালয়শেয়ান নিয়োগকর্তার সঙ্গে যাচাইযোগ্য সম্পর্ককে মানদ-পূরণ করবে, তাকে বাজারে প্রবশের সুযোগ দেওয়া যতে পারে। তারপর নিয়মিত কর্মসংপাদন মূল্যায়ন স্কোর প্রকাশ করা যতে পারে। কোন এজেন্সির মাধ্যমে কতজন কর্মী গছেন, কর্মীর গড় অভিবাসন ব্যয় কত ছিল, কতজন প্রত্যাশিত চাকরি পেয়েছেন, কত অভিযোগ হয়েছে এবং কতগুলো নিষ্পত্তি হয়েছে এসব তথ্য জনগণের জন্য উন্মুক্ত করা সম্ভব। তাহলে একজন কর্মী নিজের সিদ্ধান্ত নতিে পারবেন কোন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে যাবেন। ভিসা আছে, চাকরি পরে হবে এই ধারণা বন্ধ করতে হবে।

অতীত অভিজ্ঞতার সবচেয়ে বড়দায়ক দিক হচ্ছে বৈদেশি পট্টানোর পর কর্মীর চাকরি না পাওয়া কিংবা প্রত্যাশিত কাজে পরিবর্তে অন্য কাজে নিযুক্ত হওয়া। একজন সাধারণ বাংলাদেশি কর্মীর জন্য বৈদেশিযাত্রা কোনো পর্যটন নয়। তাঁর পছন্দে থাকে একটি পরিবারকে কয়েক বছরের সঞ্চে, কখনো জমি বিক্রি টাকা, কখনো ঋণ। তাই একজন কর্মী বৈদেশি ওঠার আগেই তাঁর জানা উচিত কে তাঁর নিয়োগকর্তা, কোথায় কর্মস্থল, কী কাজ করবেন, মাসিক মূল বেতন কত, অতিরিক্ত কর্মঘণ্টার নিয়ম কী, আবাসন কে দেবে, চুক্তির মেয়াদ কত এবং চাকরি হারালে কী ব্যবস্থা থাকবে। আমাদের নীতি হওয়া উচিত আগে যাচাইকৃত চাকরি, পরে কর্মী। ডিজিটাল প্রযুক্তির যুগে নিয়োগকর্তা যাচাইকরণ কঠিন হওয়ার কথা নয়। বাংলাদেশ ও মালয়শেয়ার সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের তথ্যব্যবস্থা সংযুক্ত করে প্রতিটি কর্মীর জন্য ডিজিটাল অ্যামপ্লয়মেন্ট রেকর্ড তৈরি করা সম্ভব।

অদক্ষ শ্রমিক নয়, দক্ষ জনশক্তি। মালয়শেয়ার বাজার নিয়ে আমাদের পুরোনো চিন্তা পরিবর্তন করতে হবে। আমরা দীর্ঘদিন শ্রমিক পাঠানোকে লক্ষ্য হিসেবে দেখেছি। ভবিষ্যতে লক্ষ্য হওয়া উচিত দক্ষতা পাঠানো। মালয়শেয়ার অর্থনীতি পরিবর্তিত হচ্ছে। ম্যানুফ্যাকচারিং, ইলেকট্রনিক্স, অটোমেশন, লজিস্টিক্স, আধুনিক নির্মাণ, হাসপাতালটি এবং বিভিন্ন প্রযুক্তিনির্ভর সেবার বিস্তার ঘটছে। বাংলাদেশে যদি শুধু সাধারণ শ্রমিক পাঠাতে থাকে, তাহলে আমরা আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারে মূল্যশৃঙ্খল এর নতিে স্তরেই থকে যাব। একই তরুণকে কয়েক মাস প্রশিক্ষণ দিয়ে মেশিন অপারেটর, ওয়েল্ডার, ইলেকট্রিশিয়ান, প্লাম্বার, নির্মাণকাজে কারিগরি কর্মী, মোটরযান কারিগরি কর্মী, পরিচর্যাকর্মী অথবা আত্মিয়েতা খাতের কর্মী হিসেবে পাঠানো গেলে তাঁর আয় উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়তে পারে। অর্থাৎ শ্রমবাজার সম্প্রসারণের পাশাপাশি প্রতি কর্মীর বাজারমূল্য বাড়ানো এখন জাতীয় কৌশল হওয়া প্রয়োজন।

বাংলাদেশ-মালয়শেয়া শ্রম অভিবাসন নিয়ে আমার গবেষণার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উপলব্ধি হলো, বৈদেশি যাওয়ার সিদ্ধান্ত সাধারণত একজন ব্যক্তির একক সিদ্ধান্ত নয়। এটি একটি পরিবারিক সিদ্ধান্ত। পরিবার অর্থ দেয়, ঝুঁকি নিয়ে, সম্পদ বিক্রি করে এবং কয়েক বছর অপেক্ষা করে ভবিষ্যৎ লাভের জন্য। আবার সামাজিক নেটেওয়ার্ক-আগে থকে বৈদেশি থাকা আত্মীয়, বন্ধু কিংবা পরিচিতি ব্যক্তি-কর্মীর

সদ্বিধান্ত ও গনতন্ত্র নবিসাচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। সূতরাং একজন কর্মী প্রতারণা হলে কষ্টগিস্ত হয় একটি পরিবার। এই কারণেই অভবিসন শাসনব্যবস্থাকে শুধু বমিনবন্দর পর্যন্ত কর্মী পাঠানোর প্রশাসনিক কার্যক্রম হিসেবে দেখলে চলবে না। প্রাক-অভবিসন প্রশিক্ষণ থেকে শুরু করে বদিশে কর্মকাল এবং দশে প্রত্যাভর্তন-পুরো অভবিসন চক্রকে নীতরি আওতায় আনতে হবে।

রমেটিয়ান্সরে পরবর্তী প্রশ্ন: তারপর কী? বাংলাদেশে অর্থনীতিতে প্রবাসী আয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের সাম্প্রতিক গবেষণাতেও বাংলাদেশে অর্থনৈতিক প্রাণশক্তি অভবিসন ও প্রবাসী আয়ের গুরুত্বপূর্ণ অবদান উঠে এসছে। কিন্তু রমেটিয়ান্সরে পরিমাণই শেষ কথা নয়। একজন কর্মী দশ বছর মালয়েশিয়া থেকে দেশে ফরি যদি আবার বেকার হয়ে পড়নে, তাহলে তাঁর দীর্ঘ অভবিসন অভিজ্ঞতার অর্থনৈতিক সম্ভাবনার একটি অংশ অপচয় হয়। তাই কর্মীদের বদিশে গমনরে পূর্ববর্তী প্রশিক্ষণ এর মধ্যে আর্থিক সাক্ষরতা থাকা উচিত-সঞ্ছয়, ব্যাংকিং, বৈধ রমেটিয়ান্স, বীমা, বনিয়োগ এবং দেশে ফরোর পর কষুদ্র উদ্যোক্তা হওয়ার পরকিল্পনা। তখন একজন অভবাসী কর্মী শুধু প্রবাসী অর্থ প্রেরণকারী থাকবনে না; তিনি ভবিষ্যতরে বনিয়োগকারী ও উদ্যোক্তা হতে পারবনে।

বাংলাদেশে ও মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার বহুবার উত্থান-পতনরে মধ্যে দিয়ে গেছে। বাজার খোলে, বপিলসংখ্যক মানুষ প্রস্তুত নিয়ে, কোনো অনিয়ম বা নীতগিত বরোধ দেখা দিয়ে, আবার বাজার সংকুচিত বা বন্ধ হয়। এই বরিতমূলক ও পুনঃচালুকরণ নীতিকািরও জন্যই ভালো নয়। দুই দেশে মধ্যে একটি স্থায়ী বাংলাদেশ-মালয়েশিয়া শ্রমবাজার কাঠামো গড়ে তোলা প্রয়োজন, যখনে সরকার, নিয়োগকর্তা, রকির্টুটি এজেন্সি এবং কর্মীর প্রতিনিধিত্ব থাকবে। প্রতিক্ষয় মাসে শ্রম চাহদি, কর্মীর প্রকৃত অভবিসন ব্যয়, বতেন, অভযোগ, চাকরচ্ছুতি, অনর্থভিক্ত অভবিসন-অবস্থা এবং রমেটিয়ান্স প্রবাহ পর্যালোচনা করা যতে পারে। এর ফলে সমস্যা সংকটে পরিণিত হওয়ার আগই ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হবে।

বাংলাদেশে জন্য মালয়েশিয়ার গুরুত্ব শুধু কতজন কর্মী সখোনে কাজ করনে, তা দিয়ে বিচার করলে ভুল হবে। মধ্যপ্রাচ্যরে ওপর অতিরিক্ত নরিভরতার বাইরে শ্রমবাজার বৈচিত্র্যকরণরে কষ্টেরেও মালয়েশিয়া গুরুত্বপূর্ণ। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দ্রুত বকাশমান অর্থনীতির সঙ্গে বাংলাদেশে জনশক্তির সংযোগ ভবিষ্যতে আরও গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। তাই মালয়েশিয়ার বাজার নিয়ে কোনো সদ্বিধান্তে স্বল্পময়োদি ব্যক্তি বা গোষ্ঠীস্বার্থরে জায়গা থাকা উচিত নয়। একটি রকির্টুটি এজেন্সি লাভ করবে এটি ব্যবসার স্বাভাবিক নিয়ম। কিন্তু সেই লাভরে ভিত্তি যদি হয় একজন দরিদ্র কর্মীর অস্বাভাবিক অভবিসন ব্যয়, তাহলে ব্যবস্থাটি টেকেই হতে পারে না। সরকাররে কাজ ব্যবসা বন্ধ করা নয়; বরং এমন প্রতযোগিতামূলক ব্যবস্থা তৈরিকাি, যখনে ভালো ব্যবসা টকিবে এবং শোষণমূলক ব্যবসা বাদ পড়বে।

প্রায় দুই দশক ধরে শ্রম অভবিসন ও রমেটিয়ান্স নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে আমরা বারবার একটি বিষয়

উপলব্ধি করছে, অভাবিসন নজি উন্নয়ন নয়; সুশাসতি অভাবিসন উন্নয়নের শক্তিশালী মাধ্যম। একজন মানুষ বদিশে গেলেই তাঁর পরিবার ধনী হয়ে যায় না। তাঁর অভাবিসনের ব্যয়, চাকরির নিশ্চয়তা, আয়, কর্মপরিবেশ, রেমিট্যান্স পাঠানোর পদ্ধতি এবং দেশে ফেরার পর সঞ্চারে ব্যবহার সবকিছু মিলিয়েই অভাবিসনের প্রকৃত অর্থনৈতিক ফলাফল তৈরি হয়। মালয়েশিয়ার বর্তমান শ্রমবাজার নিয়ে তাই বতিরককে শুধু ২৫টি এজেন্সি বিনামূল্যে এজেন্সি বতিরককে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না। আমাদের আরও বড় প্রশ্ন করতে হবে আমরা আগামী দশ বছরে মালয়েশিয়ায় কী ধরনের বাংলাদেশি কর্মী দেখতে চাই? ঋণগ্রস্ত, অদক্ষ এবং কম মজুরির শ্রমিক? নাকি প্রশিক্ষিত, স্বল্প ব্যয়ে অভাবিসতি, আইনি সুরক্ষাপ্রাপ্ত এবং তুলনামূলক উচ্চ আয়ের দক্ষ বাংলাদেশি কর্মী? আমার কাছে উত্তরটি পরিস্কার। বাংলাদেশকে শ্রমশক্তির প্তানিকারক দেশে থেকে ধীরে ধীরে দক্ষ মানবসম্পদ সরবরাহকারী দেশ-এ রূপান্তরিত হতে হবে। আর এজন্য মালয়েশিয়া হতে পারে আমাদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষাক্ষেত্র।

সাম্প্রতিক বতিরক তাই এক অর্থে আমাদের জন্য সুযোগও সৃষ্টি করেছে। এখনই সময় নিয়ে গব্যবস্থার স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা, অভাবিসন ব্যয় কমানো, প্রত্যিোগতি বাড়ানো, নিয়ে গকর্তা যাচাইকরণ বাধ্যতামূলক করা এবং দক্ষতাভিত্তিক কর্মী পাঠানোর দীর্ঘম্যোদি পরিকল্পনা গ্রহণ করা। সাফল্যের সূচক আর শুধু হওয়া উচিত নয়, “এ বছর কতজন কর্মী পাঠানো হয়েছে?” বরং আমাদের জিজ্ঞাসা করা উচিত, একজন কর্মী কত টাকা খরচ করে গেলে, কত আয় করলে, কত সঞ্চার করলে, তাঁর পরিবার কতটা এগোল এবং শেষে পর্যন্ত বাংলাদেশে অর্থনীতি তাঁর অভাবিসন থেকে কতটা টেকেসই সুবিধা পলে?

এই প্রশ্নগুলোর উত্তর ইতিবাচক করতে পারলেই মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার বাংলাদেশে জন্য শুধু বৈদেশিক কর্মসংস্থানে একটি গন্তব্য থাকবে না; এটি হয়ে উঠতে পারে মানবসম্পদ উন্নয়ন, রেমিট্যান্স, দক্ষতা অর্জন এবং দীর্ঘম্যোদি অর্থনৈতিক অগ্রগতির একটি কার্যকর অংশীদারত্ব। অতীত আমাদের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা দিয়েছে। এখন প্রয়োজন সেই অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে ভবিষ্যৎ নির্মাণ করা।